উত্তম মাছচাষ অনুশীলন ও লাভজনক উপায়ে মাছচাষ
(Good Aquaculture Practice & Profitable Aquaculture)

বিগত কয়েক দশকে দেশে চাষের অধীনে (Aquaculture Based) মাছের উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশ মাছচাষে একটি স্থিতিশীর অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। বর্তমানের দেশে মাছের উৎপাদন বিগত ২০ বছরে তিন গুণ বেড়ে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টনে উন্নিত হয়েছে। যার মধ্যে চাষের অধীনে উৎপাদিত মাছের অবদান ১৬% থেকে বেড়ে ৫৭% উন্নিত হয়ে ২৬.৩৯ লক্ষ মে.টনে উপনিত হয়েছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেরও চাষের অধীনে মাছের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে (চাট নং ১ ও ২) সরকারী-বেসরকারী সংস্থার নানামূখী উদ্বোগসহ ব্যাক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগে মাছচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে মাছচাষের আনুষ্ভমিক (Horizontal) সম্প্রসারণের পাশাপাশি উর্ধোমূখী (Vertical) সম্প্রসারণ ঘটছে দ্রুত। মৎস্য অধিদপ্তর গ্রামপর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্পসারণের জন্য ব্যাপক উদ্বেগ গ্রহণ করায় চাষের অধীনে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম অবস্থান ধরে রেখেছে। অধিক ঘনবসতির দেশ হওয়ায় দেশের বাজারে যেমন মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনী গ্রামীণ বেকার যুবকের আত্মকর্মসংস্থানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে পুকুরে মাছচাষ। অনুক্কুল আবহাওয়া, মাছচাষর সহজ প্রযুক্তি, উপকরণের প্রাচুর্যতা গ্রাম পর্যায়ে মাছচাষের সম্প্রসারণ ঘটছে প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে বহুজাতিক কম্পানিসমূহ মৎস্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে (Aqua-business) বিনিয়োগে এগিয়ে আশাতে মাছচাষে আধুনিকায়নের ছোয়া লাগছে এবং একক আয়তন জলাশয়ে মাছের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

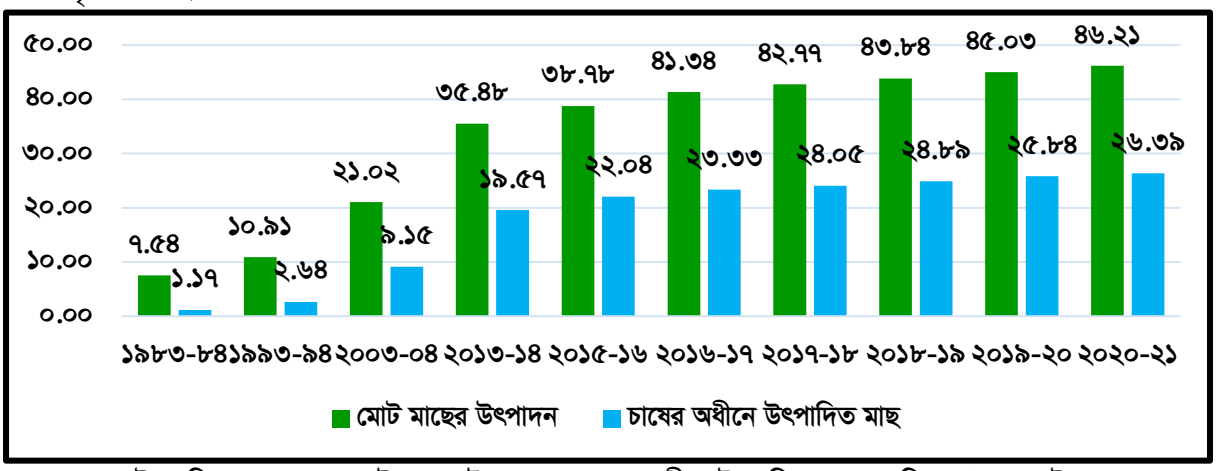

চাট ১ঃ বিগত ২০ বছরে মোট মাছের উৎপাদন ও চাষের অধীনে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)

দেশের অনেকে মাছচাষকে বাণিজ্যিকভাবে গ্রহণ করেছে ফলে মাছচাষে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি যান্ত্রিকরণের ইতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে দেশ মাছচাষে উল্লেখ যোগ্য ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে এবং এ উন্নয়নের সাথে কিছু সমস্যাও আমাদের চিন্তিত করছে। বিশেষ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ক্রমান্বয়ে আমরা চাষের অধীনে উৎপাদিত মাছের উপর নির্ভরশীল হতে চলেছি। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে আসছে (চাট-২)। চাষের অধীনে মাছের উৎপাদন বাড়ার ফলে আমাদের বাজারসমূহে মাছ সরবরাহে একটি স্থিতিশীল অবস্থা সৃস্টি হয়েছে যার কৃতিত্ব আমাদের সৃজনশীল মাছচাষিদের। তবে চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির কারণে মাছচাষে উদ্ভুত নানান সমস্যা মোকাবেলাই নানাবিধ একোয়া-প্রডাক্টসহ মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় অনেক জনস্বাস্থ্য ক্ষতিকর উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে যা পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। মাছের স্থিতিশীল বাজার সরবরাহের পাশাপাশি প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মাছ বিদেশে রপ্তানি করে আসছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪০৮৯/- কোটি টাকার সমপরিমাণ মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। রপ্তাণির এ ধারা অব্যাহত রাখা এবং দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মাছচাষের পর্যায়ে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP) বাস্তবায়ন সময়ের দাবি।

ভবিষ্যৎ রপ্তানি অব্যাহত রাখতে ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বও অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোপূর্বে শুধুমাত্র মাছ ও চিংড়ির আহরণোত্তর পরিচর্যার বিষয়টিই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বর্তমানে আহরণোত্তর পরিচর্যার পাশাপাশি চাষ পর্যায়ে "উত্তম মাছচাষ অনুশীলন" অনুসরণ করে নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীদের এবং মাছ ও চিংড়ি চাষিদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন।

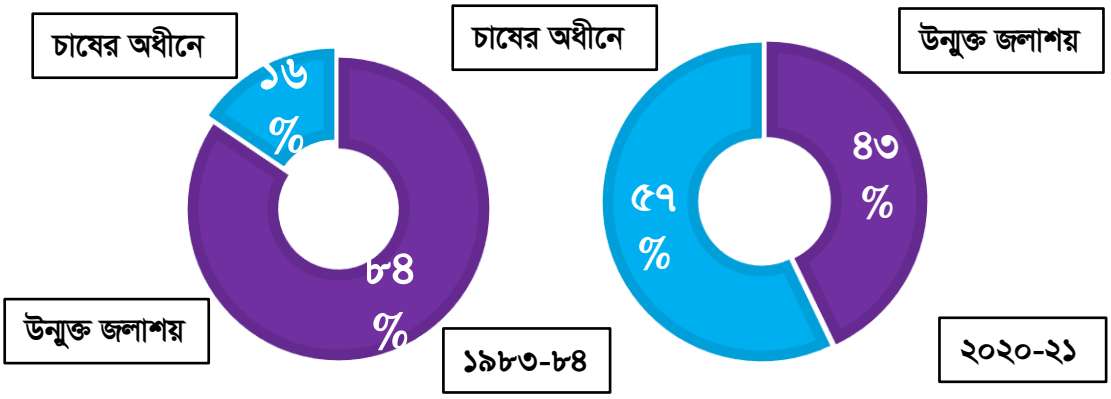

চাট ২ঃ বাৎসরিক মাছের উৎপাদনে চাষের অধীনে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ

উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP)

উত্তম মাছচাষ অনুশীলণ হলো আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত পদ্ধতি (International Standerd & Code) অনুসরণ করে মৎস্য খামারে দূষণ মুক্ত, নিরাপদ ও গুণগত মানসম্মত মাছ ও চিংড়ি বা মাছ এবং অন্যান্য মৎস্যপণ্য চাষ বা উৎপাদন, আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা করা। অর্থাৎ মাছচাষের থেকে ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত সকল পর্যায়ে উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ বুঝায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food & Agricutural Organization-FAO) উত্তম মাছচাষ অনুশীলনকে ব্যাখ্যা করতে ৫টি নীতিমালার প্রস্তাব করেছে যথা নিরাপদ খাদ্য, উৎস চিহ্নিতকরণ, পরিবেশগত সহনশীলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং শ্রম আইন প্রয়োগ। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে উত্তম মাছচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice) একটি ব্যাপক বিস্তৃত কার্যক্রম। এ প্রবন্ধে মাছচাষ পর্যায়ে উত্তম মাছচাষ অনুশীলন বিষয়াবলী বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উত্তম মাছচাষ পদ্ধতি অনুশীলনের উদ্দেশ্য

- ❖ ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা;
- ❖ মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন জীবাণু দ্বারা মাছ ও সংক্রমণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ❖ ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক (যেমনঃ নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল), ক্ষতিকর রাসায়নিক (যেমনঃ ম্যালাকাইট গ্রিণ, মিথিলিন-ব্লু), ক্ষতিকর কীটনাশক যেমনঃ থায়োডিন, এনড্রিন, ডাইএলড্রিন) ইত্যাদি দ্বারা মাছ ও চিংড়ির দূষণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ❖ চাষের শুরু থেকে আহরণ পর্যন্ত ও আহরণোত্তর প্রতিটি ধাপে চাষি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যাতে উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য (Safe Sea Food) সরবরাহে উত্তম মাছচাষ অনুশীলনের গুরুত্ব

মাছ ও চিংড়ি খাদ্য পণ্য হওয়ায় এর গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময়ই অধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। একসময় আমরা কেবল চিংড়ি বা মাছ মাছের রপ্তানির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তার মানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হত। বর্তমানে চিংড়ি সাথে সাদা মাছের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজশাহী অঞ্চল হতে সরাসরি পুকুরের পাড় থেকে প্যাকিং হয়ে বিদেশে কয়েক হাজার মে.টন পাবদাসহ অন্যান্য মাছ রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানিকৃত এসব মাছের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তাজনিত (Safety Issue) সমসা চিহ্নিত হওয়া অস্বভাবিক ও নতুন কোন বিষয় নয়। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে উত্তম মাছচাষ পদ্ধতি/ব্যবস্থাপনা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নের বিষয়গুলোর আলোচনা থেকে বুঝা যাবেঃ

ক) দূষিত পরিবেশঃ দেশের অনেক স্থানে এখানও প্রাণী উৎসের জৈব সার ব্যবহার করে মাছচাষ করা হয় যা পুকুরের পানিতে দূষণ সৃষ্টি করে। এ ধরনের দূষিত পরিবেশে উৎপাদিত মাছ পরবর্তীতে প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করা হলেও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যেতে পারে। একইভাবে আহরণোত্তর মাছ ও চিংড়ি দূষিত পানি দিয়ে তৈরিকৃত বরফ দ্বারা সংরক্ষণ করা হলেও ক্ষতিকর জীবাণু সংক্রমণের কারণে মাছের গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

খ) অপদ্রব্য ব্যবহারঃ মাছাচাষ পর্যায়ে পুকুরে নানাবিধ অপদ্রব্য ব্যবহারের বিষয় যেমন আমরা জানতে পারি তেমনই আমাদের দেশর বাজারে বিক্রয় এর জন্য আনিত মাছে এবং আমাদের দেশ থেকে রপ্তানিকৃত মাছ ও চিংড়িতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অপদ্রব্য ব্যবহার হতে দেখা যায়। অতীতে এ দেশ থেকে রপ্তানিকৃত মাছ ও চিংড়িতে লোহার টুকরা, সাগুদানা, প্লাস্টিকজেলী ইত্যাদি অপদ্রব্য ব্যহারের ফলে আমেরিকা, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মাছ ও চিংড়ির চালান ফেরত এসছে। বর্তমানে পার্শবর্তী দেশসহ আরো

বেশখিছু দেশে চিংড়ির পাশাপাশি সাদা মাছ রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে ফলে রপ্তানি অব্যাহত রাখতে এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট আইন প্রয়োগ জোরদারসহ জনসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নাই।

গ) রোগ-জীবাণু সংক্রমণঃ আহরণোত্তর বিভিন্ন পর্যায়ে মাছে নোংরা বস্তু, টাইফয়েড এবং কলেরা রোগের জীবাণু যথাক্রমে স্যালমোনেলা এবং ই-কলাই ইত্যাদি সংক্রামিত হলে মাছ রপ্তানি মারাত্বকভাবে ব্যাহত হয়। দেশের অনেক স্থানে মুরগীর বিষ্টা বা গরুর গবোর মাছচাষে ব্যাবহার হতে দেখা যায় এবং অনেক সময় মাৎস্য খামারের জলাশয় সংলগ্ন খোলা/ঝুলন্ত অনিরাপদ পায়খানা থেকে এ ধরনের জীবাণু সংক্রামণ হতে দেখা যায়।

ঘ) ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক/রাসায়নিক ও তার রেসিডুয়াল ইফেক্টঃ খামারে অ-অনুমোদিত ও অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক দ্রব্য বা এন্টিবায়োটিক ব্যাবহৃত হলে উৎপাদিত মাছে মারাত্বকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন মাছে বিদ্যমান কোন সালফাইট জাতীয় রাসায়নিক ভোক্তার শরীরে মারাত্বক এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে। মাছ ও চিংড়ি চাষের সময় বিভিন্ন ধরনের আগাছানাশক, রাসায়নিক পদার্থ, গ্রোথ প্রোমোটর বা হরমোন (বৃদ্ধির জন্য) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে তা মাছ ও চিংড়ি শরীরে বায়োএ্যাকুমিলেশনেরর মাধ্যমে জমাকৃত এ সমস্ত এন্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক দ্রব্যের রেসিডিউয়াল ইফেক্ট জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। এ জন্য অনুমোদিত মাত্রায় এ সকল দ্রব্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরী। বর্তমানে তাই ক্ষতিকর জীবাণু, বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিকের রেসিডুয়াল ইফেক্ট, রাসায়নিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে শুধুমাত্র মাছের আহরণোত্তর পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বনই যথেষ্ট নয় বিধায় উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় মাছচাষ পর্যায়ে উত্তম মাছচাষ পদ্ধতি অনুসরণ আজ সময়ের দাবি।

চিংড়ি বা মাছের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে অনুসরণীয় মাছচাষ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা (Pre-Harvest Practice)

আমাদের দেশে মাছ ও চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছুদিন আগেও আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হতো। কারণ আমরা মনে করতাম মাছ ও চিংড়ি গুণগতমান ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্যার উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খামারে উৎপাদিত মৎস্য পণ্যের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি চাষের পরিবেশের উপর অনেকখানিই নির্ভর করে। যেহেতু নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি মাছচাষর পরিবেশের সাথে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত সেহেতু চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার উপরই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাছচাষের ক্ষেত্রে উৎপাদিত মৎস্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে চাষের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নিম্নের কার্যক্রমগুলো অবশ্যই মেনে চলা জরুরী।

১) মাছের খামারে অবস্থান সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন

মৎস্য খামার স্থাপনের নিমিত্ত জায়গা বা জলাশয় নির্বাচনের সময় চাষিকে সংশ্লিষ্ট জমির অতীত ব্যবহার এবং পারিপর্শ্বিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ জমির অতীত ব্যবহার মাটির রাসায়নিক চরিত্রে গুরুত্বপর্ণ ভুমিকা রাখে। একইভাবে খামারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশু-পাখির বিচরণ বা বায়ু-বাহিত দূষণের (যেমনঃ রাসায়নিক স্প্রে) মত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আশ-পাশের পরিবেশ চাষির খামারের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন কৃষি কাজে জমি ব্যবহৃত হলে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের রেসিডিউ বিদ্যামান থাকতে পারে। এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ মাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং উৎপাদিত মাছ ভোক্তার স্বাস্থ্যহানির কারণও হতে পারে। মৎস্য খামারের আশপাশে হাঁস-মুরগীর খামার খাকলে, ময়লা আবর্জনা, গোবর বা মুরগীর পায়খানা ইত্যাদি স্তুপিকৃত করে রাখলে বর্ষার পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে মিশে মাছ দুষিত হতে পারে যা গ্রহণে ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ জন্য চাষিকে মৎস্য খামার স্থাপনের সময় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১.১. খামারের অবস্থান কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশু-পাখির বিচরণ, বা বায়ূ-বাহিত দূষণের (যেমন-রাসায়ানিক স্প্রে) মত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আশপাশের পরিবেশ মৎস্য খামারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, শিল্প ও কলকারখানার বর্জ্য নিস্কাশন এবং পয়ঃবর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদির মত মারাত্মক উৎস সংলগ্ন স্থানে মৎস্য খামার তৈরী করতে দেখা যায়। যদি কোন মৎস্য খামার কৃষি ক্ষেত, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার, জনবসতি বা বস্তির সন্নিকটে অবস্থিত হয় তাহলে চাষীকে মৎস্য খামারের উপর স্থাপনাগুলির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করতে হবে। নিয়মিত কীটনাশক ও সার ব্যবহার করা হয় এ ধরনের নিবিড় কৃষি চাষ পদ্ধতি মাছের বৃদ্ধিতে এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত মানের ওপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

রাসায়ানিক দূষণ পানিতে উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ি ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এ ধরনের রাসায়ানিক দূষণের কারণে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিষয়টিকে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে এ ক্ষেত্রে চাষীকে যা জানাতে হবেঃ

- কি কি রাসায়ানিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল;

- ❖ রাসায়ানিক দ্রব্যগুলি কখন প্রয়োগ করা হয়েছিল;
- ❖ রাসায়ানিক দ্রব্যগুলি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

গবাদি পশুর খামার বা পয়ঃবর্জ্য ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেরা, ই.কলাই, ভাইরাস ইত্যাদি) দুষণের মারাত্মক উৎস হতে পারে। এ ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু সংক্রমণের উৎস থেকে দূষণ এড়ানোর জন্য মৎস্য খামারকে উৎসগুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চাষীকে জানতে হবে ঃ

- ❖ গবাদি পশুর খামার থেকে কোন্ ধরণের দূষণ প্রবাহিত হয়ে আসতে পারে;
- ❖ গবদি পশুর খামারে কখন সবচেয়ে বেশি কার্যক্রম চলে;
- ❖ গবাদি পশুর খামার থেকে কিভাবে চিংড়ি বা মাছ খামারে দূষণ ঘটতে পারে।

প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে চাষী বুঝতে পারবেন যে, পুকুরে ক্ষতিকর রাসায়ানিকের অবশেষ ও জীবাণুর উপস্থিতির বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে হলে তাকে মাছে মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে। একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, প্রক্রিাজাতকরণ ও কুকিং এর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মাছে বিদ্যমান ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ এবং জীবাণুকে নির্মুল করা সবসময় সম্ভব হয়না।

১.২. চাষীকে কোন্ ধরনের রাসায়ানিক পরীক্ষা করবেন

আমাদের দেশের আধিকাংশ চিংড়ি বা মাছ খামারই আয়তনে ছোট। ছোট ছোট খামার মালিকেদের পক্ষে পানির কতিপয় সাধারণ মান পরীক্ষার বাইরে মাটি, পানি ও মাছের জটিল রাসায়ানিক পরীক্ষা করানো যুক্তিসংগত কারণেই সম্ভব হয় না। উন্নত দেশেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খামারের মাটি, পানি ও চিংড়ি বা মাছতে ভারি ধাতু (যেমন-পারদ, সিসা, ক্যাডমিয়াম, ইত্যাদি) কীটনাশক এবং অন্যান্য রাসায়ানিকের অবশেষের (Residue) পরীক্ষা নিয়মিতভাবে করা হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে কেবমাত্র নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সময়ই তা করা হয়।

মৎস্য খামারে নির্দিষ্ট কোন ক্ষতিকর রাসায়ানিকের দূষণ সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়টি তাই যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমে দেখতে হবে পানিতে এ ধরনের দূষণের আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, যদি থাকে তা'হলে সম্ভাবনার মাত্রা বা ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে। মাছচাষে যেভাবে এধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মিশতে পারেঃ

- ❖ যদি মাছের সাথে ধান চাষ করা হয় এবং ধানচাষে কিটনাশক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়;
- ❖ পুকুরের পাড়ে বা মাচায় সব্জি চাষ করা হরলে কিটনাশকের ব্যবহার হতে পারে;
- ❖ মাছের চাষ পদ্ধতিতে পুকুরের পানিতে অধিক পোকা-মাকড় বা বড় আকারের জু-প্লাংকটন (সুজি পোকা বা মাখোন পোকা) মারার জন্য;
- ❖ মাছের কোন কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য (মাছের উকুন)।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যেন কিটনাশকের ব্যবহার না করতে হয়। যদি তার পরেও করতে হয় তা হলে ব্যাবহারের ২০-২৫ দিন পরে মাছ আহরণ করতে হবে।

ছবিঃ ধানক্ষেতে মাছচাষ এবং পুকুরের পাড়ে সব্জি চাষ

১.৩. চাষীকে কখন জীবাণুতাত্ত্বিক পরীক্ষা করাতে হবে

রাসায়ানিক পরিক্ষার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও জীবাণু সংক্রামণের সম্ভাবনার বিষয়টি প্রথমত পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে ঃ

- পার্শ্ববর্তী নদী, পুকুর, খাল, বিল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে দূষিত পানি চিংড়ি বা মাছর খামারের প্রবেশ করতে পারে;
- গবাদি পশুর খামারের নর্দমার সংগে সরাসরি সংযোগ থাকায় মৎস্য খামারের পানি ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে;
- গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর সংগে মৎস্য খামারের পানির সরাসরি সংযোগ ঘটতে পারে;
- কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানা এবং অন্যান্য পায়ঃবর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থার সংগে সরাসরি অথবা নর্দমার মাধ্যমে সংযোগ থাকায় মানুষের মল-মূত্র ও অন্যান্য দূষিত বর্জ্য খামারের পানিতে এসে পড়েছে, অথবা
- এৎস্য খামারের মধ্যে সরাসরি অথবা নিকটে মানুষ এবং পশুর মল-মুত্র ত্যাগের কারণে পানিতে ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটতে পারে।

ছবিঃ মৎস্য খামারের সাথে হাঁস-মূরগী, ছাগল ও গরুর খামার

দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এখনো কোন কোন মাছের খামারে উপরিবর্ণিত লক্ষণগুলির কোন কোনটি বা একাধিক অবস্থা বিদ্যামান। আমাদের দেশ থেকে রপ্তানিকৃত মাছ ও চিংড়ির বিপরীতে উত্থাপিত আপত্তির ধরন এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, উপরিবর্ণিত অবস্থাগুলি এখনো পর্যন্ত আমাদের উৎপাদিত মাছ ও চিংড়ির খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। সমস্যাগুলি নিরসন করাও বেশ কঠিন: কারণ সার্বিক বির্ষয়টি মানুষের শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংগে সরাসরি সম্পৃক্ত।

২) মাছচাষের পুকুরে ব্যবহৃত পানি সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন

মৎস্য খামারের পানির মান চাষাধী মাছের স্বাস্থ্য, গুনগতমান এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দূষিত পানি যেমন মাছের মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা মাছের বৃদ্ধিতেও বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানি উৎপাদিত চিংড়ি বা মাছের দেহে ক্ষতিকর রাসায়ানিকের অবশেষ (Residue) জমা করা ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায়। পরিশেষে এই অবশেষ এবং ক্ষতিকর জীবাণূ ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হ্যাজার্ড বা বিপদ হিসেবে দেখা দেয়।
পানির উৎস দূষিত হলে স্বাভাবিকভাবে খামারের পানিও দূষিত হবে। চিংড়ি বা মাছ খামারের স্থান নির্বাচনের সময় তাই ভাল পানির উৎসের বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ত দিতে হবে। চাষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানি দূষণের কারণগুলি প্রায়শই দেখা যায়। তারমধ্যে প্রধান কারণগুলি হ'ল - ভারি ধাতুসমূহ (হেভি মেটালস) বিভিন্ন কীটনাশক এবং কৃষি-রাষায়ানিক দ্রব্য, শিল্প কারখানার রাসায়ানিক বর্জ্য এবং কলিফর্ম ও স্যালমোনেলা জীবাণূ।

প্রথমে দেখতে হবে আশাপাশের পরিবেশ থেকে খামারের পানিতে ঠিক কোন্ কোন্ ধরনের দূষণ ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ভারি ধাতুগুলির একাধিক উৎসের মধ্যে প্রকৃতিই এগুলির একটি সাধারণ উৎস। পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধাতু যেমন- আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ,

জিংক, কপার, ক্রোমিয়াম, লেড, মার্কারি, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, অ্যারিমনিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ইত্যাদি, প্রাকৃতিকভাবে স্বল্প ও নিরাপদ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই মাত্রা মাছচাষের জন্য ক্ষতিকর নয়। ভারি ধাতুসমুহের অন্যান্য উৎসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক উৎসটি হ'ল শিল্প কল-কারখানা (যেমন-ট্যানারি, কাগজের কল, ইত্যাদি)। কৃষিতেও কিছু কিছু ভারি ধাতুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কৃষির বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত কৃষি ক্ষেতে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ দমনের কাজে ব্যবহৃত হলেও মশক নিধন, ক্ষতিকর প্রাণী দমন, সবজি ও ফুলের বাগান, ইত্যাদিতে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা যায়। খামার সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহৃত হবে খামারের পানিতে কেবলমাত্র সেগুলিই পাওয়া সম্ভাবনা থাকে। কলিফর্ম ও স্যালমোনেলা এরকম আন্ত্রিক জীবাণুর দ্বারা দূষিত পানি খামারে উৎপাদিত মাছে জীবাণু ঘটিত হ্যাজার্ড সংক্রমণের মাধ্যমে তৈরী পণ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মল থেকে পানিতে কলিফর্ম ও স্যাল্‌মোনেলা জীবাণু দূষণ ঘটে থাকে। সাধারণত কলিফর্ম জীবাণুর উপস্থিতি পানিতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মল থেকে দূষণের সম্ভাব্য লক্ষণ প্রকাশ করে।

ছবিঃ পুকুরের পাড়ে মাণুষের পায়খানা এবং গরুর গবোর

২.১. পানিতে বিদ্যমান ভারি ধাতুগুলি চিংড়ি বা মাছর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিপদজনক কেন

ভারি ধাতুগুলির বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হলো এগুলি পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয় না, ফলে জলাশয়ের তলদেশে জমা হয়। চিংড়িসহ অনেক প্রজাতির মাছ জলাশয়ের তলদেশে বিচরণ করে এবং তলদেশের খাদ্য খায়। এ কারণে ভারি ধাতুগুলি সহজে চিংড়ি বা মাছের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শরীরে জমা হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে "বায়োঅ্যাকুমুলেশন" বলা হয়। মার্কারি, লেড ও ক্যাডয়িামের ন্যয় ভারি ধাতুগুলি বায়োঅ্যকুমুলেশন প্রক্রিয়ায় মাছে শরীরে জমা হয় এবং তার মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। উল্লেখিত ভরি ধাতুগুলি ক্যানসার, নার্ভাস সিস্টেমকে অকেজো করা,অন্ধত্ব, শ্রবণশক্তি হ্রাস, পঙ্গুত্ব ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। ভারি ধাতুগুলির আরেকটি বিপদজনক বৈশিষ্ট্য হলো চিংড়ি বা মাছ এবং মানুষের শরীরে প্রবেশের পর এ গুলি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন-মার্কারি মানুষের শরীরে ৭০-৭৬ দিন এবং মাছ বা চিংড়ি বা মাছর শরীরে ২০০ দিন থেকে ২ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে।

২.২. চিংড়ি বা মাছচাষর ক্ষেত্রে পেস্টিসাইড বা কীটনাশকের বিষয়টিকে কেন বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়

কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টির জন্যই কীটনাশক তৈরি করা হয় এবং কীটনাশকগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন প্রয়োগের পর সেগুলি দীর্ঘক্ষন কার্যকর থাকতে পারে। কীটনাশকের এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটিই সবার দুশ্চিন্তার কারণ। বিভিন্ন শ্রেণীর কীটনাশকের মধ্যে "ক্লোরিনেটেড পেস্টিসইডগুলি" যেমন- ডিডিটি, এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ও ক্লোরডেন মাছ বা চিংড়ির খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখিত পেস্টিসাইডগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও আমাদেরদেশে এখনো মাঝে মাঝে এগুলির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভারি ধাতুর ন্যায় পেস্টিসাইডগুলিও সহজে পানিতে দ্রবীভূত হয় না। ফলে "বায়োঅ্যাকুমুলেশন প্রক্রিয়ায়" সেগুলি মাছের শরীরে জমা হয় এবং তার মাধ্যমে তা মানুষের ক্ষতি সাধন করে।

২.৩. বায়োঅ্যাকুমুলেশন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায়

এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়ানিক পদার্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে জমা হয়। বিশেষ চরিত্রের ক্ষতিকর রাসায়ানিক পদার্থগুলি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে (ফুলকা, পরিপাকতন্ত্র, ত্বক, ইত্যাদি) প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে কিন্তু সেগুলি মল-মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। ওপরন্ত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (কোষের মধ্যে) জমা হতে থাকে। জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে বায়োঅ্যাকুমুলেশনের হারে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং তা নির্ভর করে জলজ প্রাণীর প্রজাতি, তাদের চলাফেরা ও শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্টের ওপর। জলাশয়ের তলদেশে বিচরণ ও খাদ্য গহণকারী প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমন-চিংড়ি ও মাছ) বায়োঅ্যাকুমুলেশনের হার জলাশয়ের উপরিভাগের অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ ক্ষতিকর রাসায়ানিক পদার্থগুলি পানিতে অদ্রবণীয় হওয়ায় তা স্বাভাবিকভাবেই জলাশয়ের তলদেশে জমা হয়। একারণে মাছের শরীরে ক্ষতিকর রাসায়ানিকের বায়োঅ্যাকুমুলেশন ভোক্তার জন্য মরাত্মক স্বাস্থ্য ঝুকি তৈরি করতে পারে এবং ক্যানসার, নার্ভাস সিষ্টেমকে অকেজো করা, অন্ধত্ব, শ্রবণশক্তি হ্রাস, পঙ্গুত্বসহ অন্যান্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

২.৪. মাছচাষের জলাশয়কে পেস্টিসাইড থেকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে

উপায়গুলি হতে পারে নিম্নরুপঃ

- ❖ পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়েছে বা হয় এমন কৃষি ক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে মাছচাষ করা;
- ❖ স্প্রে করা পেস্টিসাইডের বাষু-বাহিত অংশকে আটকানোর জন্য পেস্টিসাইড ব্যবহৃত চাষ ক্ষেত্র এবং মৎস্য খামারের মাঝে বৃক্ষ বা অন্যান্য লম্বা গাছ লাগানো;
- ❖ বৃষ্টি ধৌত পেস্টিসাইডযুক্ত পানি চিংড়ি বা মাছর জলাশয়ে প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত পাড় নির্মাণ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জলাশয়ের চারিদিকে পরিখা খনন;
- ❖ মাছচাষে পেস্টিসাইড না ব্যবহার করার চেস্টা করতে হবে, এ জন্য জৈব সার প্রয়োগে সতর্ক থাকতে হবে, পুকুরে নিয়মিত পরিমিত চুন ব্যবহার করতে হবে যাতে মাছে প্যারাসাইট আক্রান্ত না হয়, বাধ্য হয়ে ব্যবহার করলে পেস্টিসাইড প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা;
- ❖ অব্যবহৃত পেস্টিসাইড, পেস্টিসাইডের উচ্ছিষ্টাংশ এবং পেস্টিসাইডের কন্টেনার বা পাত্র নিরাপদ দূরুত্বে সরিয়ে ফেলা।

২.৫. মৎস্য খামারের পানিতে জীবাণুর উপস্থিতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেন

মাছচাষ এলাকায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মল-মূত্র ত্যাগের বিদ্যমান অবস্থা, পয়ঃ ও অন্যান্য বর্জ্যও নিস্কাশন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি অতিবৃষ্টির ফলে জলাশয় প্লাবিত হওয়ার মত বিষয়গুলি আমাদের দেশের পানি দুষণের প্রধান কারণ। সমস্যাটি বেশ ক্রিটিক্যালই বলা চলে। চাষ পর্যায়ে বিপদজনক উৎসের জৈব বর্জ্য, জীবাণূদুষ্ট কাঁচা খাবার এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মল বা বিষ্ঠা অগ্রহণযোগ্য ব্যবহার চাষাধিন জলাশয়ে ক্ষতিকর জীবাণু দূষণের অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়ে থাকে।

পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর জীবাণূর (প্যাথোজেনস) উপস্থিতি মাছচাষের জন্য বিপদজনক এ জন্য যে, মাছের বিচরণ ও খাদ্যাভাসের কারণে এরা খুব সহজেই মাছের দেহে জমা হতে পারে। প্যাথোজেনগুলি মাছে রোগ সৃষ্টি না করলেও মাছের বা চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষে (পরিচর্যাকারী/ভোক্তা) সংক্রমিত হতে পারে। *স্যাল্‌মোনেলা*, *ই.কলি*, *ভি.কলেরার* ন্যায় প্যাথোজেনের উপস্থিতির কারণে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানিকৃত চিংড়ি বা মাছ বিদেশ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে চাষাধীন পানিতে ক্ষতিকর জীবাণূ যেমন-*স্যাল্‌মোনেলা*, *ই.কলি* ও *ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম* অধিক সংখ্যায় উপস্থিতি থাকলে মাছের মাংসে প্যাথোজেনগুলির উপস্তিতি লক্ষ করা যায় (বুরাস,১৯৯০)। চিংড়ি বা মাছর ক্ষেত্রেও এ অবস্থা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

ছবিঃ পুকুর পাড়ে গুরুর খামার এবং পায়খানা ঘর

২.৬. মৎস্যচাষে ব্যবহৃত পানির জীবাণূগত মান কেমন হওয়া উচিত

আমরা জানি পানির পান যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পানিতে বিদ্যমান কলিফর্ম বা ফিক্যাল কলিফর্ম এর পরিমাণকে "স্যানিটারি ইনডেক্স" হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াকে " স্যানিটারি ইনেডেক্স অর্গানিজম" বলা হয়ে থাকে। চাষাধীন পানির উপযুক্ততা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ফিক্যাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণকে গ্রহণযোগ্য মাত্রা হিসেবে বিবেচনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞগণ চাষাধীন পানিতে বিদ্যামন মোট ব্যাকটেরিয়া ও স্যাল্‌মোনেলা এর ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার গ্রহণযোগ্য পরিমাণের বিষয়ে নিম্নোক্ত গাইড লাইন প্রদান করেছেনঃ

*** ফিক্যাল কলিফর্ম এর জন্য গইিড লাইন**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (১৯৮৯) এর সুপারিশ মোতাবেক চাষাধীন পানিতে ফিক্যাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ১০০ মি.লি পানিতে $১০^{৩}$ বা ১০০০ এর কম হওয়া উচিত। মারা এবং কার্নক্রস (১৯৮৯) এক গবেষণায় দেখেছেন চাষাধীন পানিতে ফিক্যাল কলিফর্ম এর প্রারম্ভিক সংখ্যা প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে $১০^{৪}$ বা ১০,০০০ থাকলেও পরবর্তীতে পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এ সংখ্যা প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে $১০^{৩}$ বা ১০০০ এ হ্রাস পেয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মাত্রাকে (প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে $১০^{৩}$) প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে $১০^{৪}$ বা ১০,০০০ পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। পানিতে ফিক্যাল কলিফর্ম ও অন্যান্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ১০০ মি.লি. পানিতে $১০^{৪}$ এবং $১০^{৫}$ এর বেশী হলে ব্যাকটেরিয়াগুলির মাছের মাংসে প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৮৯ এ ৪৩; মারা ও কার্নক্রস, ১৯৮৯,৮৯,১১৬)।

২.৭. খামারের পানির জীবণুগত মান আগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলে কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত

এরুপ অবস্থা মোকাবেলার জন্য উন্নত দেশে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পশ্চাৎপদ চাষ ব্যবস্থায় সে সুযোগ খুবই সীমিত। যাই হোক, আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব সেটি হ'ল- দূষণের উৎস দ্রুত খুঁজে বের করে তা কার্যকরভাবে নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করা। পাশাপাশি চাষাধীন পানিতে ক্লোরিনেশন (ব্লিচিং) করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ক্লোরিনের মাত্রা নির্ভর করবে পানির পিএইচ এবং পানিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থের পরিমাণের ওপর। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে প্যাথোজেন এবং অন্যান্য জীবাণু সীমিত সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। তাই সন্দেহজনক ক্ষেত্রে জলাশয়ে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পানি উঠিয়ে একটি নিরাপদ সময়ের বিরতিতে চিংড়ি বা মাছচাষ শুরু করা যেতে পারে।

৩) মৎস্য খামারের আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন

জলাশয়ের আশপাশের পরিবেশ উৎপাদিত মাছের নিরাপত্তায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মৎস্য খামারের আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার-পরিছন্নতা ও ভাল অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি স্বস্থ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। চাষ পর্যায়ে অনেক সময় ভুমি ক্ষয় বা ভূমি ধ্বস ঘটে থাকে যা চাষীর জন্য সরাসরি আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়া ছাড়াও পানিতে রাসায়ানিক ও জূবাণূ দূষণ ঘটায়। জলাশয়ের চারদিকে পরিকল্পিত উপায়ে ঘাস লাগালে ভুমিক্ষয় বা ভুমিধ্বস রোধ করারর পাশাপাশি জলাশয়ে রাসায়ানিক ও জীবাণু ঘটিত দূষণকেও রোধ করা যায়। এছাড়া জলাশয় এবং আশপাশ থেকে ঝোপ ঝাড়, অতিরিক্ত জলজ আগাছা এবং ময়লা পরিস্কার করে ফেলা জরুরী। এ কাজগুলো করতে হবে কারণ ঃ

- ভুমি ক্ষয়/ভুমি ধ্বস জলাশয়ে রাসায়ানিক ও জীবাণু ঘটিত দূষণ সৃষ্টি করে।
- ঝোপ-ঝাড়, জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা ক্ষতিকর প্রাণীকে (পেস্ট) আকৃষ্ট করে।

৩.১. ক্ষাতিকর প্রাণী (পেস্ট) কিভাবে উৎপাদিত মাছের নিরাপত্তায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে

মৎস্য খামারের বন্য প্রাণীর বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ দুরুহ ব্যাপার এবং এ জন্য একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা চাষীর জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জও বটে। ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখি এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণূ (যেমন-*স্যালমোনেলা*, ই.*কলি*, ইত্যাদি) সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ উৎস হতে পারে। বিভিন্ন মৌসুমী ও অতিথি পাখি (যেমন- হাঁস জাতীয় পাখি এবং সী-গাল) অথবা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যেন মাছের খাবার এবং চিংড়ি বা মাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সরাসরি জলাশয়ে বা জলাশয়ের আশপাশে অথবা মাছের খাবার তৈরী বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানের নিকটে মল-মূত্র ত্যাগ করা হলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জীবাণূ (যেমন-*স্যালমোনেলা*, ই.*কলি*, ইত্যাদি) পানিতে বা খাবারে মিশে পরিশেষে উৎপাদিত মাছে সংক্রমিত হয়। খামারে উৎপাদিত মাছের এই সংক্রমণ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে বাহিত পরিশেষে ভোক্তার নিকট পৌছায় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়।

ইঁদুর জাতীয় প্রাণী অনেকগুলি রোগ সৃষ্টিকারী জীবণুর বাহক এবং যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে এরা খুব সহজেই খাদ্যকে সংক্রমিত করতে পারে। খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ এবং খাদ্য প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ এলাকায় এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী।

বিভিন্ন ধরনের পাখিও মাছচাষের জন্য সমস্য তৈরী করে থাকে। সরাসরি মাছ ধরে খাওয়া ছাড়াও এরা জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের জীবাণূ সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। ছোট আকারের খামারে পাখির উৎপাদ বন্ধের জন্য পুকুরের উপরে জাল ব্যবহার করতে দেখা যায়। বড় বড় খামারে উচ্চ ক্ষমতার শব্দ যন্ত্র এবং কুকুর ব্যবহার করে পাখি তাড়াতে দেখা যায়। তবে এ কাজে কুকুরের ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। কারণ কুকুর থেকে বিশেষ করে কুকুরের মল-মূত্র থেকে অনেক প্রকার রোগ-জীবাণূ বিস্তার ঘটে থাকে।

ছবিঃ পুকুরে নেটের ব্যাড়া এবং নেট ও সুতা আবৃত পুকুর

চিংড়ি বা মাছ খামারের আশপাশে কিভাবে ইঁদুর ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়

চিংড়ি বা মাছ খামারে ইঁদুর ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর উৎপাদ দু'ভাবে কমানো যায় ।ঃ

I. ইঁদুরের উপযোগী আশ্রয়স্থল নির্মূল করা এবং লোভনীয় খাবর সরিয়ে ফেলা।
II. ক্ষতিকর প্রাণী (পেষ্ট) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা।

I. ইঁদুরের উপযোগী আশ্রয়স্থল নির্মূল করা এবং লোভনীয় খাবার সরিয়ে ফেলা

খাবার তৈরি, ব্যবহার জন্য প্রস্তুত এবং সংরক্ষণের স্থান এবং আশাপাশ থেকে সকর পরিত্যাক্ত দ্রবাদি, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি পরিস্কার করে ফেলতে হবে। ঝোপ-ঝাড়, নালা-নর্দমা এবং জলজ আগাছা পরিস্কার করে ফেলতে হবে। খাবার তৈরি, ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এবং সংরক্ষণের স্থান সমূহ নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে এবং বর্জ্য, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, ইত্যাদি যত দ্রুত সম্ভব পরিস্কার করে ফেলতে হবে। চিংড়ি বা মাছর খাবার সুরক্ষিত পাত্রে রেখে এমন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে যেখানে ইঁদুর ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এবং কীট-পতঙ্গ প্রবেশ করতে না পারে।

II. ক্ষতিকর প্রাণী (পেস্ট) নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা।

মৎস্য খামারের যে সমস্ত স্থানে ক্ষতিকর প্রাণী বিচরণ করতে পাওে বলে সন্দেহ করা হয় সে সকল সম্বাভ্য স্থানে বিভিন্ন ধরণের ফাঁদ ও বিষ টোপ স্থাপন করা যেতে পারে। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে ফিউমিগেশন পদ্ধতি ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি আবর সংক্রমণ বা দুষণের উৎস হিসেবে কাজ না করে। ফাঁদ স্থাপন বা ফিউমিগেশনের কাজ সরাসরি চিংড়ি বা মাছ, মোড়ক সামগ্রী, আহরণ ও পরিচর্যার কাজে ব্যবহৃত পাত্র বা চিংড়ি বা মাছর খাবার এবং চিংড়ি বা মাছর সংস্পর্শে আসে এমন কোন কিছুর ওপর বা সন্নিকটে করা যাবেনা। মনে রাখা জরুরী যে, যথাযথভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ না করা হলে ক্ষতিকর প্রাণী দমণে ব্যবহৃত রাসায়ানিক দ্রব্যগুলি খামারের চিংড়ি বা মাছতে দূষণ সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যবহারকারীকেও মারাত্মকভাবে অসুস্থ্য করতে পারে। এ সমস্ত বিষাক্ত রাসায়ানিক ব্যবহারের পুর্বে ব্যবহারকারীর উচিত হবে প্রয়োজন মত বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা-পোষাক (যেমন-বিশেষ ধরনের চশমা, দস্তানা, মুখোশ, ইত্যাদি) পরিধান করা।

৪) মৎস্য খামারে অনুসরণী স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা বা হাইজিন প্র্যাকটিস

চিংড়ি বা মাছ খামারে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত মানুষের মল ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভুত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণূ নিয়ন্ত্রণ বা পশু-পাখির মল ও বর্জ্যেও সার হিসাবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রন করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে বিপদজনক বিষয়টি হলো এই যে, স্তন্যপায়ী বা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ভিবরিয়া, কলেরা, প্যাথোজেনিক ই.কলি, ইত্যাদি) বহন করে যা মৎস্য খামারে বিস্তার লাভ করতে পারে।

৪.১. চাষী কিভাবে মানুষের মল বা বর্জ্য সম্পর্কিত সমস্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মৎস্য খামারে, বিশেষ করে জলাশয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মল-মূত্রের দূষণকে নুন্যতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। মৎস্য খামারে কর্মরত লোকজনকে কোন অবস্থাতেই পুকুরের পানিতে,পাড়ে, পুকুর সংলগ্ন এলকায়, পানির উৎস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন সব জলাশয়ে (নদী-খাল ইত্যাদি) মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া খামার সংলগ্ন এমন সব স্থানেও মল-মূত্র ত্যাগ করতে দেওয়া যাবে না, যেখান থেকে মল-মূত্র বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়তে পারে। মৎস্য খামারের কর্মীদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে স্যানিটারি পায়খানা তৈরি করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন মলাধার হতে চুইয়ে দূষিত পদার্থ জলাশয়ে না পড়তে পারে। যেখানে কোন পায়খানার ব্যবস্থা নেই বা তৈরী করাও সম্ভব নয়, এমন প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্য খামারে মল–মূত্র ত্যাগের সমস্য সামলানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের প্লাষ্টিক পাত্রের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে একটি সহজ ব্যবস্থা হতে পারে।

৪.২. পুকুরে মাছচাষে মানুষ ও পশুর মল, মুরগির বিষ্ঠা এবং অন্যান্য জৈব সার ব্যবহার করা যাবে কি না

অতীতে মৎস্য খামারের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য পুকুর প্রস্তুতের সময় এবং পোনা মজুদের পর বিভিন্ন জৈব সার প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হলেও বর্তমানে তা মাছের গুনগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ায় ব্যবহার না করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। মানুষ এবং পশুর মল কেবলমাত্র মৎস্য খামারে মারাত্মক দূষণই ঘটায় না তা সংশ্লিষ্ট চাষী ও অন্যান্যদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। প্রকৃত পক্ষে মাছচাষের খরচ কমানোর জন্য আগে পুকুরে প্রণিজ জৈব সার ব্যবহার করা হত যা বর্তমানে কিছু এলাকায় এখোনও দেখা যায়। যারা মুরগীর বিস্টা দিয়ে মাছচাষ করে তাঁরা বেশ কয়েকটি সমস্যা সাথে নিয়ে মাছচাষ করেন। প্রধান সমস্যাগুলো হলো ঃ

- পুকুরের পানিতে ব্যাপক দূষণ ঘটে যার জন্য যে কোন সময় পুকুরে গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে সমস্ত মাছ মারা যেতে পারে;
- যে কোন মূহুর্তে পুকুরে অক্সিজেন স্বল্পতা সৃষিাট হয়ে মাছে মড়ক দেখা দিতে পারে;
- পুকুরের আশপাশে ব্যাপক বায়ু দূষণ সৃষ্টি করে মানুষের বসবাসে সমস্যা সৃষ্টি করে;
- বৃষ্টিপূর্ণ আববোহাওয়ায় এবং রৌদ্র উজ্জল গরম দিনে পুকুরের মাছে ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়;

- পুকুরের মাছে পিড়ন সৃষ্টি হওয়ায় মাছে প্রতি নিয়ত রোগের প্রাদূর্ভব দেখা দিয়ে চাষির মাছচাষে খরচ বৃদ্ধি করে;
- মাছের ফ্লেশে দূগন্ধের সৃষ্টি হয় যা চাষের মাছের প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ কমিয়ে দেয়;
- এধরনের চাষের মাছ চাষি নিজে না খেলেও বাজারে বিক্রয় করে নৈতিকভাবে অপরাধ করে থাকেন;
- এধরনের চাষ পদ্ধতিতে একক আয়তন জলাশয়ে বেশি মাছ উৎপাদন করা যায় না ফলে প্রকৃত পক্ষে চাষি পর্যাপ্ত লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

পুকুরে অপরিশোধিত মল ও বিষ্ঠাকে সার হিসাবে ব্যবহার করে মাছচাষের খরচ কমাতে গিয়ে চাষি মাছচাষে অধিক লাভথেকে বহি্ছত হওয়ার পাশাপাশি মাছের গুগণতমান ও খাদ্য নিরাপ্তার ওপর বিরুপ প্রতিত্রিয়া সৃষ্টি করে। সংগত কারণেই তাই মৎস্য খামারের উল্লেখিত উৎসের জৈব সার ব্যবহার না করাই উত্তম। তাছাড়া পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন অজৈব সার যদি কোন প্রকার বিরুপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই দক্ষতার সাথে প্রয়োজনীয় কাজটি করতে পারে তাহলে জৈব সারের ঝঁকিপূর্ণ ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রাণীর মলের বিকল্প জৈব সার কি হতে পারে।

- নিয়ন্ত্রিত পন্থায় উৎপাদিত কম্পোষ্ট জৈব সার হিসবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;
- সরিষার খৈল (২-৩ দিন পানিতে ভিজিয়ে) উত্তম একটি জৈব সার যা মাছচাষে ব্যাহার করা যেতে পারে;
- বর্তমানে মাছচাষে ইস্ট মোলাসেস মিশ্রণ পুকুরের জলাশয়ে প্রাকৃকিত খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি ৩০ শতক পুকুরের জন্য ৪-৫ কেজি অটোকুড়া অথবা কমদামের আটা অথবা ভূট্টার গুড়ার সাথে ৪-৫ কেজি চিটাগুড় এবং ৫০ গ্রাম ইস্ট একত্রে পর্যাপ্ত পানিতে ১ দিন ভিজিয়ে রেখে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দেয়া।

৫) মাছের খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতার উত্তম অনুশীলন

মাছ ও বিশেষ করে চিংড়ি একটি উচ্চ মূল্যের পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে এর যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দেয়ার ক্ষেত্রে চাষী খুবই সচেতন। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষী অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় নিম্ন মানের খাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমনি সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্ন মানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কেবল মাছের জন্য ক্ষতিকরই নয় তা ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিও তৈরি করে। শুধু তাই নয়, চাষ পর্যায়ে ব্যবহৃত খাদ্যে অগ্রহণযোগ্য বা ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা মাছের এবং ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তুলতে পারে।

৫.১. সঠিক খাদ্য নির্বাচনে চাষীর কী করণীয়

বর্তমানে মাছচাষ পদ্ধতিতে দেশজ উপাদানে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত খাদ্যের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত খাদ্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাছচাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বাজারে নতুন নুতন ব্রান্ডেন প্রস্তুত খাদ্য যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি মাছচাষ ক্ষেত্রে এর ব্যবহারও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্রান্ডের খাদ্য ব্যবহার করা উচিত হবে এবং এ বিষয়ে বিশেষযজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের দায়বদ্ধতা থেকেই চাষীকে মৎস্য খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য চাষীকে যা করতে হবেঃ

- কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎসের খাদ্য ব্যবহার করতে হবে;
- খাদ্যের উৎস নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- উত্তম রুপে সংরক্ষিত খাদ্য মাছচাষে ব্যবহার করতে হবে;
- খাদ্যে ব্যবহৃত উপাদানের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি খাদ্য পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে হবে।

৫.২. মৎস্য খাদ্যে কোন উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না

দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রাকৃতি খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাড়তি তৈরী খাবার প্রদান একটি স্বাভাবিক বিষয় হলেও অনেক সময় অভিজ্ঞতা এবং অসতর্কতার কারণে খাদ্যের মাধ্যমে মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু ও ক্ষতিকর রাসায়ানিকের অবশেষের (Residue) সংক্রমণ ও সঞ্চারণ ঘটে থাকে। যেহেতু মাছ বড় করার জন্য খাদ্যের কোন বিকল্প নাই এবং মাছ যে খাবার খেয়ে বড় হয় সে খাবারের সাথে গ্রহণকৃত উপকরণের সাথেই মাছের শরীরে উপকারী ও ক্ষতিকর উপাদান প্রবেশ করে। সে জন্য মাছের খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্খ ভূমিকা রাখে উৎপাদিত মাছ নিরাপদ হবে না অনিরাপদ হবে। মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যাহারের জন্য উপকরণ নির্বাচনে বিশষ শতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তৈরী খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার এবং ফ্যাট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় বাণিজ্যিক কারণেই একাধিক উৎস থেকে তা সংগ্রহ করা হয়। আমিষ ও ফ্যাটের উৎস হিসেবে ফিশ মিল্ এবং মাছের তেল দীর্ঘ দিন যাবত ব্যবহার হয়ে এলেও সম্প্রতি তাতে ডাইঅক্সিন এর ন্যায় ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়ানিক অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়ানিকের অবশেষ, যেমন-পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেঞ্জোফুরানস্ এবং পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলস্ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ফিশ মিল্ ও ওয়েলে এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসায়ানিকের উপস্থিতির বিষয়টি

সংশ্লিষ্ট মাছচাষ এলাকা, চাষের অবস্থা এবং পারিবার্শ্বিক দূষণের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্যে ফিশ মিল ও ওয়েলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিকল্প উৎস হিসেবে উদ্ভিদজাত আমিষ এবং ওয়েলের ব্যবহর বাড়ানো যেতে পারে।

মৎস্য খাদ্যে শ্বেতসারের উৎস্য হিসেবে সাধারণত অটোকুড়া, ডিওআরবি, গমের ভূষি, চাল, ভুট্রা ও গম চুর্ণ এবং্ আটার ও ময়দা ব্যবহার হয়ে থাকে। উৎপাদন পর্যায়ে এ সমস্ত শস্যে নিষিদ্ধ কটিনাশক ও অনুমোদিত কীটনাশকের মাত্রারিক্ত ব্যবহার খাদ্যের মাধ্যমে মাছে কীটনাশকের ক্ষতিকর অবশেষ (Residue) জমা করে। এ ছাড়া গুদামে সংরক্ষণের সময় অসাস্থ্যকর অবস্থা ও অব্যবস্থাপনার কারণে খাদ্যে বিশেষ এক ধরণের মোল্ড বা ছত্রাক তৈরি হয় যা আফ্লাটক্সিন নামক বিষ উৎপাদন করে। উল্লেখ্য, এই বিষ রান্নার তাপমাত্রায় নষ্ট হয়না। দুষিত খাদ্যেও মাধ্যমে এই টক্সিন মাছের শরীরে জমা হয়। এ সমস্ত বিষের অবশেষ (Residue) পরিশেষে মানুষের স্বাস্থের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। নিরাপদ খাদ্য তৈরির জন্য কেবলমাত্র নিরাপদ উৎসের শস্য ও শস্যদানা ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করতে হবে এবং সংগৃহীত শস্য, শস্যদানা ও তৈরি খাবার যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ছত্রাক প্রতিরোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

চাষ পর্যায়ে মাছকে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাচাঁ খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ি-ভূঁড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া, চুর্ণ, ইত্যাদি দেয়া হয়। এ ধরণের খাবার ব্যবহাওে চাষীরা বেশি উৎসাহী, কারণ তাতে খরচ কম। কিন্তু, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের কাঁচা খাবার যেমন বিভিন্ন রোগজীবাণূ বহন করে তেমনি খুব নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় তা প্রস্তুত করার কারণে মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী যেমন-স্যালমোনেলা, ভি.কলেরা, ই.কলি, ইত্যাদি দ্বারা সংক্রমিত হয়ে যায়। জীবাণু এইস সব কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানি দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গনুাগুণ নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে মাছের ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। তবে এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে-জীবাণু সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।

চাষ পর্যায়ে সাধারণ খাদ্যের পাশাপাশি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিভন্ন ঔষধ মিশ্রিত খাদ্যের (মেডিকেটেড ফিড) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঔষধ মিশ্রিত খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ঔষধের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা রাখতে হবে। মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্যে ফ্লেভোমাইসিন নামক বিশেষ এক ধরনের বৃদ্ধি সহায়ক এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মানব দেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে।

৫.৩. স্থানীয়ভাবে খাদ্য তৈরির সময় কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

খামারে উৎপাদিত মাছের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাদ খাদ্য ব্যবহার একটি অত্যাবশ্যীয় কাজ। একইভাবে, নিরাপদ খাদ্য তৈরিতে সঠিক উপাদান ব্যবহারের পাশাপাশি কতিপয় উত্তম ব্যবস্থাপনা বা প্র্যাকটিস অনুসরণ করাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। নিচে এ ক্ষেত্রের গুরুত্তবপূর্ণ অভ্যাসসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

- ❖ কেবলমাত্র ক্ষতিকর জীবাণূ ও রাসায়ানিকমুক্ত উপাদান ব্যবহার করতে হবে;
- ❖ দীর্ঘ দিনের বাসি ও ছত্রাকযুক্ত উপদান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;
- ❖ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন উপাদান ব্যবহার করা যাবে না;
- ❖ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ও জীবাণূমুক্ত সরঞ্জমের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করাতে হবে;
- ❖ খাদ্য তৈরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে রোগমক্ত হতে হবে; বিশেষ কওে হাতে কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত আছে এমন ব্যক্তি খাদ্য তৈরিতে নিয়োজিত হবে না;
- ❖ আমিষজাতীয় কাঁচা খাবর ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যাবহার করতে হবে;
- ❖ তৈরি খাবারের সবটুকু একবারে ব্যবহার করতে হবে। অব্যবহৃত খাবার পুনরায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে;
- ❖ খাদ্যে কেবলমাত্র অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে। ঔষধ মিশ্রিত খাদ্য তৈরির সাথে সাথে তাতে প্রয়োজনীয় বিবরণসহ লেবেল লাগাতে হবে;
- ❖ কাজ শেষে অব্যবহৃত উপাদানসমূহকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং খাদ্য তৈরির স্থান ও সরঞ্জামসমূহ ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণূমুক্ত করতে হবে।

৫.৪. মৎস্য চাষী কিভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করবেন

প্রত্যাশিত সময় পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী মান ধরে রাখার জন্য খাদ্য শুষ্ক, পরিষ্কার ও শীতল স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও স্যাঁত স্যাঁতে স্থানে সংরক্ষণ করা হলে মোল্ড বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে খাদ্যে বিভিন্ন বিষাক্ত দ্রব্য (যেমন- আফ্লাটক্সিন) উৎপন্ন হতে পারে। এই টক্সিন উচ্চ তাপেও (কুকিং তাপমাত্রা) নষ্ট হয় না। ফলে টক্সিযুক্ত চিংড়ি বা মাছ ও মাছ ভোক্তার জন্য বিপদজনক হতে পারে। খাদ্য উচ্চ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হলে পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে যায়। রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধযুক্ত খাদ্য ভালভাবে লেবেল লাগিয়ে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্য থেকে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

মৎস্য খাদ্য সংরক্ষণের সময় নিচের বিষয়গুলি সতর্কতার সাথে মেনে চলতে হবে ঃ

- মেয়াদ উত্তীর্ণ, ভেজা বা খারাপ অবস্থায় সরবরাহকৃত খাদ্য কখনই গ্রহণ করা যাবেনা;
- মাছকে কখনই মোল্ড বা ছত্রাকযুক্ত খাদ্য খাওয়াবেন না;
- সঠিকভাবে লেবেল লাগিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে;
- পরিষ্কার, শুষ্ক ও শীতল স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে;
- খাদ্যকে সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
- খাদ্য সংরক্ষণের স্থানে কোন অবস্তাতেই কীটনাশক, আগাছানাশক, সার, তেল, মবিল ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকদ্রব্য রাখা যাবে না। কীটনাশক, আগাছানাশক ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিকদ্রব্য থেকে দুষণ ঘটতে পারে এমন স্থানের আশপাশেও খাদ্য সংরক্ষণ করা যাবে না;
- গুদামে খাদ্য সংরক্ষণের সময় "ফাস্ট-ইন-ফাস্ট-আউট" নিয়ম অনুসরণ করতে হবে; অর্থাৎ সংরক্ষিত খাদ্যের আগের চালান আগে ব্যবহার করে ফেলতে হবে;
- যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে নির্ভূলভাবে খাদ্যের মজুদ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সবসময় নূতন ও পুরাতন খাদ্যকে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ঔষধযুক্ত খাদ্যকে স্বাভাবিক খাদ্য থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬) মৎস্য খামারে ঔষধ ব্যবহারের উত্তম অনুশীলন

অন্যান্য চাষের ন্যায় চিংড়ি বা মাছচাষও রোগবালাই দমনের জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করা হয়। প্রধান প্রধান চিংড়ি বা মাছ উৎপাদনকারী দেশে আধা-নিবিড় ও নিবিড় চিংড়ি বা মাছচাষ বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ঔষধের ব্যবহার একটি পুরানো এবং প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার এখনো বেশ সীমিত। এটি আমাদের মাছের সুনামের জন্য সহায়ক।

প্রাণীকূলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হলেও এর অপব্যবহার আবার প্রাণীর জন্য মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষের ক্ষেত্রে মাছর রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অবশেষে চাষীর জন্য বিপদ ডেকে আনে। অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ ব্যবহার মাছের দেহে এন্টিবায়োটিকের অবশেষ (Residue) জমা করে এবং মাছের মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানবদেহে এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার জনিত বিপদজনক অবস্থা গুলি হতে পারে ঃ

- রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর ঔষধ-প্রতিরোধী জাতের (ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেইন) উদ্ভবহতে পারে;
- অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে;
- ক্ষতিকর বিষক্রিয়াসৃষ্টি করতে পারে;
- মানুষের অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ ধরনের স্টেইন সৃষ্টি হতে পারে।

চাষ পর্যায়ে অতীতে ব্যবহৃত কতিপয় এন্টিবায়োটিক মানবদেহে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ সৃস্টির জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চাষ পর্যায়ে শুধুমাত্র অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও জারি করা হয়েছে।

আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি বর্তমানে চরম উৎকর্ষে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বর্তমানের ভোক্তা পূর্বেও যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। কোন খাদ্যপণ্য ক্রয়ের পূর্বে তাই ভোক্তা তার "ফুড সেফটি" এর বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। মাছের প্রসংগে বলা যায়, ভোক্তা খাদ্য হিসেব অর্থ দিয়ে নিরাপদ মাছ ক্রয় করতে চায়, এন্টিবায়োটিক তথা ঔষধের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে রোগ নিরাময়ের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা এবং এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারকে সর্বশেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করা।

৬.১. মাছচাষী ঔষধ ব্যবহারের বিষয়টি কিভাবে সম্পন্ন করবেন

চাষ পর্যায়ে ঔষধের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার চাষীর জন্য উপকারর পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই চাষাধীন মৎস্য খামারে নিয়োজিত কর্মী, পরিবেশ এবং ভোক্তার স্বাস্থ্যের ওপর ঔষধের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ, মাত্রা নির্ধারণ এবং এর অবশেষ নিঃশেষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম) সতর্কতার সাথে মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি ষ্টোরে ঔষধ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ এবং খালি প্যাকেট বা পাত্র ফেলে দেয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল তথ্য যথাযথভাবে সঙরক্ষণ করতে হবে। তথ্য সংরক্ষণ করলে ঔষধ ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন পাওয়া যাবে তেমনি ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময় পূরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যাবে। এছাড়া এই রেকর্ড সম্ভাব্য সমস্য নিরসনেও বিশেষ ভুমিকা রাখবে।

৬.২. চাষ পর্যায়ে চাষী কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করবেন

চাষ পর্যায়ে সাধারণত খাবারের সাথে অথবা পানিতে গুলে বা মিশিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। প্রতিটি ঔষধ কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ঔষধের প্যাকেটের গায়ে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। ব্যবহারের সকল পর্যায়ে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করে যেমন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে তেমনি মাছ ধরার পূর্বে ঔষধটির নির্ধারিত "অবশেষ নিঃশেষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম)" সঠিকভাবে পুরণ করতে হবে। অধিক পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করা হলে তা মাছের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করতে পারে। ফলে মাছ মারা যেতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ মাছের মাংসে এক প্রকার কটু স্বাদ তৈরি করে। সর্বোপরি, মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ ব্যবহারের মারাত্মক কুফলটি এই যে, এর ফলে ক্ষতিকর জীবাণুও "ঔষধ প্রতিরোধী (ড্রাগরেজিষ্টান্ট) জাত" তৈরি হয়। বর্তমান সময়ে এন্টিবায়োটিকের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার জনস্বাস্থের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক রেজিষ্ট্যান্ট অনুজীবের সৃষ্টি। মাছচাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাষে উদ্ভূত নানা ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় চাষি বুঝে না বুঝে যথাযথ পরার্শ গ্রহণ ছাড়ায় মাছচাষে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক। মনে রাখা দরকার রোগাক্রান্ত মাছ খাবারই খায় না তা হলে ঔষধ খাবে কিভাবে? মাছের রোগের সমস্যায় মাছের চিকিৎসা না করে পুকুরের পানির চিকিৎসায় বুদ্ধি মানের কাজ।

৬.৩. ঔষধ মাত্রা কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

ঔষধের প্রয়োগ নির্ভর করে রোগের প্রকোপ, ব্যবহারের পর্যায় এবং পয়োগ পদ্ধতির ওপর। তবে ঔষধের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্যাকেট বা পাত্রের গায়ের লেবেলে মাত্রার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা গাইড লাইন প্রদান করে থাকেন। লেবেলে দেয়া নির্দেশনা বা গাইড লাইন ভালভাবে পড়ে এবং বুঝে, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

৬.৪. ঔষধের অবশেষ নিঃশষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম) বলতে কি বুঝায়

মাছের দেহে ঔষধের অবশেষ নিঃশেষের সময় বলতে ঐ সময় বুঝায় যে সময়ের মধ্যে চিংড়ি বা মাছর শরীর থেকে প্রয়োগকৃত ঔষধের অবশেষ (Residue) নির্মুল হয় বা গ্রহণযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। ঔষধ প্রয়োগের পর এই সময় মেনে মাছ ধরা হলে মাছের শরীরে ব্যবহৃত ঔষধের অবশেষ না থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। অবশেষ নিঃশেষের এই সময় একটি স্থায়ীভাবে বেধে দেয়া বা মাছের ক্ষেত্রে এটি "ডিগ্রি দিনে" প্রকাশ করা হয়। যেহেতু মাছের শরীর থেকে ঔষধ বা এ জতীয় জিনিসের অবশেষ নিঃশেষের সময় চাষাধীন পানির তাপমাত্রা পরিবর্তনের কারণে কম বেশি হয় সে জন্য অবশেষ নিঃশেষের সময়কে ডিগ্রি দিনে প্রকাশের মাধ্যমে পানির তাপমাত্রা পরিবর্তনের বিয়ষটিকে সমন্বয় করা হয়েছে। পানির তাপমাত্রা কম হলে "অবশেষ নিঃশেষের সময়" বেশি হবে এবং তাপমাত্রা বেশি হলে ঐ সময় কম হবে।

উল্লেখ্য যে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ভুক্ত দেশসমুহের মাছের জন্য বেঁধে দেয়া "অবশেষ নিঃশেষের সময়" ৫০০ ডিগ্রি দিন। ঘোষিত ডিগ্রি দিন। ঘোষিত ডিগ্রি দিন থেকে "অবশেষ নিঃশেষের সময়" হিসেব করে বের করার জন্য এটিকে চাষাধীন পানির গড় তাপমাত্রা (°সে.) দিয়ে ভাগ করতে হয়। উপরি-উক্ত ৫০০ ডিগ্রি দিন থেকে "অবশেষ নিঃশেষের সময়" কিভাবে বের করতে হবে তা নিচে দেখানো হলো।

ধরা যাক যে পানিতে মাছচাষ করা হচ্ছে মাছে ঔষধ প্রয়োগের পর থেকে ধরার আগ পর্যন্ত ঐ পানির গড় তাপমাত্রা ২৫° সে.। তাহলে ৫০০ কে ২৫ দিয়ে ভাগ করলে (৫০০÷২৫=২০) যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেটিই চিংড়ি বা মাছর বা মাছের "অবশেষ নিঃশেষের সময়"। এক্ষেত্রে ২০ দিন।

৬.৫. ঔষধ সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং এবং ফেলে দেওয়ার কাজগুলি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে

এ কাজগুলি ঔষধ প্রস্তুতকারী নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। ঔষধ সংরক্ষণ করতে হবে, খাবারের সাথে বা পানিতে কিভাবে মিশাতে হবে কিভাবে ঔষয় প্রয়োগ করতে হবে, ব্যবহারের পর অবশিষ্ট ঔষধ বা খালি প্যাকেট ও পাত্র কিভাবে কোথায় ফেলতে হবে, ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলি ঔষধের প্যাকেট বা পাত্রের গায়ে লাগানো লেবেলে বর্ণিত থাকে। লেবেলে বর্ণিত নির্দেশনা ভালভাবে পড়ে ও বুঝে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্মন্ন করতে হবে। সংরক্ষণের সকল পর্যায়ে ঔষধকে খাদ্যবস্তু, খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে এমন স্থান, খাদ্যবস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জমাদি এবং মোড়ক সামগ্রী থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৃথকভাবে রাখতে হবে। সংরক্ষণের স্থানে এবং ব্যবহারের সকল পর্যায়ে ঔষধের লেবেলবিহীন প্যাকেট বা পাত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। সংরক্ষণের স্থানে এবং ব্যবহারের সকল পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। নির্দিষ্ট ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মূল প্যাকেট ব পাত্রের ঔষধ অন্য পাত্রে রাখলে উক্ত পাত্রের গায়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় লেবেলে লাগিয়ে নিতে হবে। ঔষধ হ্যান্ডলিং এর সামগ্রিক কাজটি কেবলমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে।

৬.৬. চাষ পর্যায় কোন ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা যাবে

চাষ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ঔষধের অনুমোদিত একক তালিকা এখনো প্রণয়ণ করা সম্বভ হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ উৎপাদিত মাছ পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে,

যেমন-ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও অন্যান্য দেশ। তাই চাষ পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেকিত দেশসমূহে তার অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা রাখা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (সংশোধিত জুন-২০০৮) এর তফসিল-১৭এ প্রদত্ত "নিষিদ্ধ ঘোষিত বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, রাসায়ানিক দ্রব্যের তালিকা" অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে "একুয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা" অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন।

৭. চিংড়ি বা মাছর আহরণ-পূর্ব মূল্যায়নের উত্তম অনুশীলন

চাষের সময় সাধারণত প্রত্যেক চাষী নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নমুনায়নের মাধ্যমে মাছ ও মাছর আকার, পরিমাণ এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরনের রুটিন চেকআপ, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবিই প্রয়োজন। চাষ পর্যায়ে মাছ ধরার আগে এই রুটিন চেকআপ মাছের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়নের একটি বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দেয়। খামারের উৎপাদিত মাছের গুণগতমান ও খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা কাঙ্খিত ষ্ট্যান্ডার্ড অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা মাছ ধরার পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরী। এ জন্য মাছ আহরণের ৭-১০ দিন আগে একটি আহরণপূর্ব পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা উচিত। কারণ, আহরণের পর মাছের গুণগতমান এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তখন চাষী বা প্রক্রিয়াকরণকারীর পক্ষে আর তেমন কিছু করার সুযোগ থাকেনা। পক্ষান্তরে, আহরণ-পূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়ন ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনী সংশোধনী ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্য গন্ধ ও স্বাদের মাছই আহরণ করতে হবে। চাষ পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু কারণে মাছে অস্বাভাবিক স্বাদ তৈরি হয়। যেমন-পুকুরে বিশেষ এক ধরনের কটু স্বাদ তৈরি হয়। এছাড়া খাবারের সাথে বা অন্যবিধ উপায়ে মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগের কারণেও এ ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে। চাষ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা নেয়া হলে গন্ধ ও স্বাদের এ অস্বাভাবিক দূর করা যায়। শৈবালজনিত সমস্যা দূর করার জন্য পুকুরে প্রয়োজন মত চুন প্রয়োগ করে পানির পিএইচ বৃদ্ধি করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে চুন প্রয়োগ করে শৈবাল দমনের কাজটি ৩ থেকে ৫ দিন ধরে সতর্কতার সাথে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া পুকুরের পানি পরিবর্তন এবং একই সাথে অ্যারেটর ব্যবহার করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়। সমস্যাটির জন্য মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগ দায়ী হলে অনতিবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, সমস্যা সমাধানের জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হোক না কেন আহরণের পূর্বে পুনরায় স্বাদ ও গন্ধের পরীক্ষা করে এর সন্তোষজনক অবস্থার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

মাছ ও চিংড়ির আহরণের পূর্বে চাষ পর্যায়ে ব্যবহৃত ঔষধের জন্য নির্ধারিত "অবশেষ নি:শেষের সময় (উইথড্রয়াল টাইম)" পূরণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঔষধ প্রয়োগের রেকর্ডটি ভালভাবে দেখে নিতে হবে। অবশেষ নি:শেষের সময় পূরণ করা না হলে আহরণ বন্ধ রেখে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৮) সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে উত্তম অনুশীলন

মাছ বা চিংড়ি বা মাছচাষর ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ি বা মাছ খাদ্য নিরাপত্তার ওপর সরাসরি প্রভাব না ফেললেও টেকসই মাছ বা চিংড়ি বা মাছচাষ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং চাষ এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। এ জন্য ঘের/খামার মালিককে দেশের প্রচলিত আইনসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে ঃ

- প্রাকৃতিক জলাশয় ধ্বংস করে এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ঘের/খামার নির্মাণ করা যাবে না;
- প্রাকুতিক জলাশয়ে মৎস্য খামার করলে দেশীয় প্রজাতির মাছগুলো আমরা হারিয়ে ফেলব, জলজ জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের সংরক্ষণের জন্য এ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে;
- প্রাকৃতিক পরিবেশে চলমান পানির প্রবাহ বন্ধ করে খামার স্থাপন করা যাবে না;
- গ্রামীণ সড়কের ক্ষতি করে মৎস্য খামার স্থাপন করতে হবে;
- অন্যের জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না করতে পারে মৎস্য খামার স্থাপনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে;
- বিশেষ করে তিন ফসলী জমিতে পুকুর খনন করে মাছচাষ করলে দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।

৯) শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের ব্যবহার সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন

মাছচাষের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের ন্যায় শ্রম অধিকার ও শিশু শ্রমের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে "শ্রম আইন ২০০৬" বিদ্যমান আছে। আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

- সকল শ্রমিককে লিখিত নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র দিতে হবে;
- দূর্ঘটনার কোন শ্রমিকের মৃত্যু বা পঙ্গ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;
- ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করালে ওভার টাইম দিতে হবে;

- ❖ সপ্তাহে একদিন সাধারণ ছুটি দিতে হবে;
- ❖ ১৪ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

১০) আহরণের সময় অনুসরণীয় উত্তম অনুশীলন

খামারে মৎস্য আহরণের কাজটি এমন কতগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় যা উৎপাদিত চুড়ান্ত পণ্যের গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি হল:

- ➢ খাবার কমিয়ে দিতে হবে বা ১ দিন আগে খাবার বন্ধ করে দেয়া;
- ➢ আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ, কর্মী প্রস্তুর রাখা;
- ➢ ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাছ ধরতে হবে;
- ➢ হ্যান্ডলিং ও পরিবহন ব্যবস্থা আগে থেকে প্রস্তুত রাখা:
- ➢ জীবিত মাছের ক্ষেত্রে পরিবহনের আগে সংরক্ষণের জন্য পানির ফুয়ারা সহ হাউজ;
- ➢ মাছ ধরার সময় খেয়াল রাখতে হবে মাছ যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়, অঙ্গ বিনস্ট না হয় এবং ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি না হয়;
- ➢ মাছ ধরে রৌদ্রে নয় ছায়া যুক্ত ঠান্ডা স্থানে ছড়িয়ে রাঢ়তে হবে;
- ➢ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপযুক্ত মানের বরফ সংগ্রহে রাখা;
- ➢ মাছ পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ক্যারেট/পাত্র;

ছবিঃ শুকনা পাটাতনের উপর বরফায়িত মাছের ক্যারেট

- ➢ মাছ ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখা, বিশেষ করে বরফ ঠান্ডা ক্লোরিন যুক্ত পানি;
- ➢ সরাসরি হাত দিয়ে মাছ হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গ্লোভস) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভাল;
- ➢ মাছ ধরা, সাময়িক সংরক্ষণ ও পরিবহনের সময় মাছে যেন তেল, মবিল, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিকের দূষণ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে;
- ➢ সংক্রমণ জনিত রোগ আক্রান্ত কর্মী মাছের নাড়া চাড়া কাজে না নিয়জিত করা।

মাছ ধরার কাজটি সাধারণত: নোংরা অবস্থায় হলেও মাছ রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা থেকে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। মাছ রাখা এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেট, টাব ও অনান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর অতিমাত্রায় গুরত্ব আরোপের ফলে সাধারণভাবে আমার মনে করে থাকি যে, কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্যার উপরই মাছের গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভরশীল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, খামারে উৎপাদিত মাছের গুণগতমান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি মূলত: চাষের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। নিরাপদ খাদ্যের (Safe Sea Food) বিষয়টি মাছচাষের চাষের পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় নিরাপদ মাছ প্রাপ্তির সফলতা অর্জন অনেকাংশেই চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত।